30 MAY 2008

যুগান্তর

উপবৃত্তির সুফল মিলছে না

ড্রপআউটের হার উদ্বেগজনক

মুসতাক আহমদ

নারী শিক্ষায় উপবৃত্তিও কাঙ্ক্ষিত সুফল বয়ে আনছে না। সামাজিক প্রতিবন্ধকতা, দারিদ্র্য ও পাঠ গ্রহণে টিউটরের নির্ভরতা দূর করা না গেলে এ কর্মসূচি কোনকালেই সুফল বয়ে আনবে না বলে সংশ্লিষ্টরা জানান। অনুসন্ধানে জানা গেছে, বর্তমানে মাধ্যমিকে ৮৬ ভাগ এবং উচ্চ মাধ্যমিকে ৬০ ভাগ ছাত্রী ড্রপআউট করছে। অথচ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে এ খাতে বছরে প্রায় পৌনে ৩শ' কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। শিক্ষা সচিব মোঃ মোমতাজুল ইসলাম এই উদ্বেগজনক ড্রপআউটের জন্য শিক্ষকদের দায়ী করে বলেছেন, শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসে আকৃষ্ট করতে পারছেন না। তাছাড়া ক্লাসে উপস্থিতি ও মেধামান নির্ধারণ করে দেয়ায় ড্রপআউট বাড়ছে। দেখা গেছে, মেধাবী দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণেই সঠিক পরিমাণ ক্লাসে উপস্থিত থাকতে পারে না এবং নির্দিষ্ট মান সুফল : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

সুফল : উপবৃত্তির

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অর্জন করে না। অপরদিকে গ্রামাঞ্চলের অপেক্ষাকৃত বিত্তবানদের সন্তানরা প্রাইভেট টিউটর রেখে পরীক্ষায় কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জন করে। সে কারণে এই বৃত্তির মূল লক্ষ্য ব্যাহত হচ্ছে। অথচ সরকার শুধু উপবৃত্তি নয়, শিক্ষকদের বেতন-ভাতার পেছনে বছরে প্রায় সাড়ে ৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে। তিনি আরও বলেন, ড্রপআউট করলেও সামগ্রিক বিচারে স্কুল-কলেজে ছাত্রী উপস্থিতি এবং পরীক্ষায় ছাত্রীসংখ্যা বেড়েছে। এটাই প্রকল্পের সফলতা।

এদিকে উপবৃত্তি নিয়ে চলতি বছর চালু হওয়া নতুন নিয়ম এই ড্রপআউটের হার আরও বাড়াবে বলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষক এবং শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তারা আশংকা করছেন। যুগান্তরের প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন, চলতি বছর চালু হওয়া নতুন নিয়ম অনুযায়ী, 'প্রো-পুওর টার্গেটিং প্রোগ্রাম'র আওতায় মোট শিক্ষার্থীর ৩০ ভাগ ছাত্রী এবং ১০ ভাগ ছাত্রকে উপবৃত্তি দেয়া হচ্ছে। দরিদ্র, মেধাবীসহ অন্যান্য শর্ত পূরণসাপেক্ষে তারা লাভ করবে এই উপবৃত্তি। দেশের বিভিন্ন স্থানে বর্তমানে এ প্রোগ্রামের পাইলট প্রজেক্ট চলছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ইতিমধ্যেই নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। একদিকে উপবৃত্তি-বঞ্চিত হয়ে অনেক ছাত্রী স্কুল ছাড়ছে, অন্যদিকে যারা স্কুলে থাকছে তারাও স্কুলের বিভিন্ন পাওনা পরিশোধ করছে না। এ অবস্থায় ড্রপআউট আরও কমপক্ষে ১০ ভাগ বাড়তে পারে বলে সংশ্লিষ্টরা আশংকা করছেন।

বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে উপবৃত্তি গ্রহণকারী মোট ছাত্রীর ৬০ ভাগই ঝরে পড়ছে। বিগত তিন বছরের হিসাবে দেখা গেছে, সর্বমোট ৮ লাখ ৩২ হাজার ছাত্রী এই বৃত্তি গ্রহণ করে। এর মধ্যে ৪ লাখ ৯৩ হাজার ছাত্রীই এইচএসসি পরীক্ষায় বসতে পারেনি। এ সময়ের মধ্যে প্রকল্পের অধীনে এসব ছাত্রীর পেছনে সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ১৮৪ কোটি টাকা। অন্যদিকে মাধ্যমিক স্তরে অর্থাৎ ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর ছাত্রীদের পেছনে সরকার বছরে প্রায় ২শ' কোটি টাকা উপবৃত্তি বাবদ ব্যয় করে। তিনটি প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যয় হয় এই অর্থ।

উচ্চ মাধ্যমিক স্তর

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রীদের বিনা বেতনে পড়ালেখার পাশাপাশি উপবৃত্তি দেয়া শুরু হয় ২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষে। উচ্চ মাধ্যমিকের জন্য তখন সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে 'উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্রী উপবৃত্তি' নামে তিন বছর মেয়াদি এ প্রকল্প শুরু হয়, যার মেয়াদ শেষ হবে আসন্ন জুনে। শিক্ষা সচিব জানান, ছাত্রীদের উঠিয়ে আনতে হলে এ প্রকল্প অব্যাহত রাখতে হবে। এজন্য আরও তিন বছরের জন্য প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব তারা করেছেন। প্রকল্প সূত্রে জানা গেছে, এই তিন বছরে সারাদেশের সাড়ে ৫ হাজার কলেজের ৮ লাখ ৩২ হাজার ছাত্রী উপবৃত্তি গ্রহণ করে। এর মধ্যে মাত্র ৩ লাখ ৩৯ হাজার শিক্ষার্থী এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। প্রকল্পের প্রথম বছর বা ২০০৬ সালে উপবৃত্তিপ্রাপ্ত মোট ছাত্রীর মধ্যে ৮৯ হাজার এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। পরের দু'বছর সংখ্যা অবশ্য বাড়ে। ২০০৭ সালে ১ লাখ ১৬ হাজার এবং ২০০৮ সালের পরীক্ষায় এ সংখ্যা ১ লাখ ৩৯ হাজার।

নাম প্রকাশ না করে প্রকল্পের একজন শীর্ষ কর্মকর্তা জানান, উপবৃত্তি লাভের শর্তের মধ্যে রয়েছে— ছাত্রীর এসএসসিতে জিপিএ-২.৫ [illegible]তে হবে, ক্লাস উপস্থিতি থাকতে হবে ৭৫ [illegible] এবং অবিবাহিত থাকতে হবে। এছাড়া [illegible]শ থেকে দ্বাদশ শ্রেণীতে জিপিএ-২.৫ [illegible] উত্তীর্ণ হতে হবে। তিনি বলেন, উপবৃত্তি নিয়ে এইচএসসি পরীক্ষা দেয়নি এরকম ছাত্রীদের বেশিরভাগই দরিদ্র পরিবারের কন্যা। ভর্তির মাধ্যমে তারা উপবৃত্তি লাভের উপযোগিতা লাভ করলেও তা ধারাবাহিকভাবে পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না বেশিরভাগই। আবার যেসব ছাত্রী উপবৃত্তি লাভ করছে, তাদের বেশিরভাগ সচ্ছল পরিবারের সন্তান। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, দরিদ্র পরিবারের মেয়েরা একদিকে প্রমোশনের শর্ত পূরণ করতে পারে না, অন্যদিকে নানা কারণে ক্লাস উপস্থিতিতেও তারা পিছিয়ে থাকে। নাম প্রকাশ না করে একাধিক কর্মকর্তা বলেছেন, যেহেতু এসএসসি পর্যায়ে উপবৃত্তির শর্ত শিথিল করা হচ্ছে, তাই এইচএসসি পর্যায়েও এ বিষয়টি বিচার-বিবেচনা করা উচিত।

শিক্ষা সচিব মোঃ মোমতাজুল ইসলাম অবশ্য বলেছেন, প্রকল্পের প্রথম বছর ৮৯ হাজার ছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নেয়। তিন বছরের মাথায় এ সংখ্যা বেড়ে এবার ১ লাখ ৩৯ হাজার হয়েছে। অর্থাৎ ৫০ ভাগ ছাত্রী বেড়েছে। এটাই প্রকল্পের সফলতা। তিনি বলেন, উপবৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রীদের ৬০ ভাগই ড্রপআউট করাটা উদ্বেগজনক বিষয়। এজন্য ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসে আকৃষ্ট কিংবা পরীক্ষায় পাস না করাতে পারা প্রধানতম কারণ। এর জন্য একমাত্র দায়ী শিক্ষকরা।

মাধ্যমিক স্তর

মাধ্যমিক স্তরে এ কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৯৪ সালে। কিন্তু ১৪ বছর পরও মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রী ড্রপআউটের হার প্রায় ৮৬ ভাগ। কানাডার সাইমন ফ্রেজার ইউনিভার্সিটির গ্রাজুয়েট মিজ জেনিফার হোড সম্প্রতি বাংলাদেশের ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এগ্রিকালচার এন্ড টেকনোলজি'র (আইইউবিএটি) ভিজিটিং ফেলো হিসেবে এক গবেষণায় দেখিয়েছেন, ষষ্ঠ শ্রেণীতে যে সংখ্যক ছাত্রী ভর্তি হয়, তার মধ্যে মাত্র ১৪ ভাগ এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। অথচ চারটি (বর্তমানে তিনটি) প্রকল্পের মাধ্যমে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকেই উপবৃত্তি দেয়া হয়ে থাকে। মিজ হোডের গবেষণা মতে, সবচেয়ে বেশি ড্রপআউট হয় সপ্তম থেকে অষ্টম শ্রেণীতে ওঠার সময়ে। ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত যে ড্রপআউট হয় তার ৩২ ভাগই হয় এ সময়ে। এছাড়া ষষ্ঠ শ্রেণীতে ১৬, অষ্টম শ্রেণীতে ১৬, নবম শ্রেণীতে ১৬ এবং দশম শ্রেণীতে ২০ ভাগ ড্রপআউট করে।

চলতি বছর চালু করা উপবৃত্তির নতুন নিয়ম ড্রপআউট আরও বাড়াবে। তিনটি প্রজেক্টের মধ্যে এসইএসডিপি প্রজেক্টের আওতায় 'প্রো-পুওর টার্গেটিং প্রোগ্রাম'-এর নামে এখন থেকে মোট ছাত্রীর ৩০ ভাগ এবং ১০ ভাগ ছাত্র পাবে উপবৃত্তি। বাকি ৬০ ভাগই পাবে না। অথচ আগে ছাত্রী হলেই এবং শর্ত পূরণ করলেই উপবৃত্তি লাভ করত। সংশ্লিষ্টদের আশংকা, এ প্রজেক্টের আওতাধীন ৫৩টি উপজেলায় শিক্ষায় ইতিমধ্যে ধস নামবে।

শিক্ষা সচিব যা বলেন

শিক্ষা সচিব যুগান্তরকে বলেন, আইন অনুযায়ীই ১৮ বছরের নিচে কোন মেয়ের বিয়ে দেয়া যায় না। সুতরাং বিয়েটা ড্রপআউটের ক্ষেত্রে কারণ হওয়া উচিত নয়। আর যে শিক্ষক ক্লাসরুমে ছাত্রছাত্রী ধরে রাখতে পারেন না, তার থাকা না থাকা সমান কথা। স্কুল-কলেজগুলোয় ঠিকমতো পাঠদান না হওয়ার পেছনে গভর্নিং বডির ব্যর্থতাকেও তিনি দায়ী করে বলেন, শিক্ষকদের টিকিউআই (শিক্ষক মান উন্নয়ন) প্রকল্পের অধীনে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। অভিভাবকদেরও সন্তানের ব্যাপারে তদারকি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।